# সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্র ও নারী : পঞ্চম থেকে একাদশ শতক

সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত সমাজচিত্রের ছকটা নির্ণীত হয় শাস্ত্র সমাজকে যে অনুশাসন দেয় তার দ্বারা। অবশ্যই সাহিত্যিকের স্বাধীনতা আছে এ কাঠামোকে অতিক্রম করবার, স্বাধীন স্বপ্ন দেখবার, নির্দিষ্ট সামাজিক অনুশাসন বা পরম্পরাক্রমে আগত কাঠামোর সমালোচনা করবার। সীমিত এই স্বাধীনতা সংস্কৃত সাহিত্যেও কখনো কখনো দেখা গেছে, কিন্তু মোটের ওপরে সাহিত্য সামাজিক নিয়মকে লঙ্ঘন করেনি, তাকে প্রতিবিম্বিত করেছে মাত্র। অতএব প্রথমে এই কাঠামোকে সাধারণভাবে চিনে নেওয়া ভাল।

শূদ্রের ক্ষেত্রে ধর্মসূত্র থেকে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে বলেছে যে তার স্থান অন্য তিন বর্ণের নিচে এবং তার একমাত্র কর্তব্য হল সর্বতোভাবে এদের সেবা করা। পরবর্তীকালে জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের দ্বারা এই মতকে দৃঢ় করা হয়েছে এই বলে যে পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে শূদ্রের শূদ্রজন্ম, এবং এজন্মে যথোপযুক্তভাবে দ্বিজসেবা করলে পরজন্মে সে উচ্চতর বর্ণে জন্মাবে ; এজন্মে দ্বিজসেবায় ত্রুটি ঘটলে সে আরও হীন পশুযোনি প্রাপ্ত হবে। এই সব মত চালু থাকার ফলে শূদ্রের স্থান ছিল ত্রিবর্ণের পাদপীঠে। সব শূদ্র দাস নয়, শূদ্রদের মধ্যে অভাগ্যতর যারা তারাই দাস, অন্যরা বৃত্তিজীবী। এই বৃত্তিজীবীদের দুটি ভাগ : অনিরবসিত ও নিরবসিত অর্থাৎ জলচল ও জল-অনাচরণীয়। এই দ্বিতীয়ভাগে আছে বৃষল, পুল্কস, শ্বপাক, ডোম্ব, চণ্ডাল।

সাহিত্যে দুরকম শূদ্রই পাই। কালিদাসের 'রঘুবংশে' আদর্শ রাজা দিলীপের বর্ণনায় জাতি সম্বন্ধে কালিদাসের কালের সমাজের যে বোধ ছিল তার একটি দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা পাই : 'মনুর খুঁড়ে-দেওয়া পথটি থেকে তাঁর প্রজারা এক চুলও এদিক ওদিকে যেত না'। (১৪ / ৬৭) অর্থাৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের কালে মনুসংহিতার অনুশাসনই অলঙ্ঘ্য ছিল। মনুসংহিতায় জন্মভিত্তিক জাতি, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, দ্বিজের অধিকার ও শূদ্রের সর্বাত্মক হীনতা সুদৃঢ়ভাবে কীর্তিত ও অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলে এক জেলের দেখা পাই, পুলিসরা যাকে বিদ্রূপ করছে তার বৃত্তি নিয়ে। তার ধরা মাছের পেটে



Scanned with CamScanner

ঘাসিক এরা সব চলেছে। এদের ওপর খবরদারি করছে গরিব গেরস্থবাড়ির ছেলেরা। সৈন্যদল চলেছে ভারেভারে প্রয়োজন ও বিলাসের উপকরণ নিয়ে। ছোট ছোট কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসছে সৈন্যরা, আত্মীয়রা বাইরে এসে বিদায় দিচ্ছে তাদের। হাতির পায়ের তলায় দলে পিষে গেল কত কুঁড়েঘর, বাসিন্দারা কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে এসে মাহুতদের উদ্দেশে ঢিল ছুঁড়ছে। সৈন্যদের সঙ্গে চলেছে চুন্দী বা কুট্টনী, থপ্‌থপে মোটা বর্ষীয়সী, এদের দেখে হাসাহাসি করছে লোকেরা। গেরস্থবাড়ির বউরা চলেছে বাহনে চড়ে ; তাদের চারদিকে ভিড় করেছে মন্দ লোকেরা, যাদের পাঠিয়েছে অভিজাত পুরুষরা ঐ বউদের ফুস্‌লে আনার জন্যে। সৈন্যদলের যাত্রাপথে হাতি ঘোড়ার দানাশস্য ছড়িয়ে পড়েছে। আশপাশের লোকেরা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দুঃস্থ কুলপুত্ররা সৈন্যযাত্রার নিন্দে করছে। গরিব গ্রামের লোকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টে বলদ নিয়ে এসে তাদের পিঠে বোঝা চাপিয়েছে তারা, দুর্বল বলদগুলো ভার বইতে পারছে না বলে এরা নিজেরাও কাঁধ দিয়েছে বইবার জন্যে। বলছে, 'এই সৈন্যযাত্রা শেষ হলে বাঁচি। উচ্ছন্ন যাক এসব, শেষ হোক এই অতিলোভ, চাকরিকে দণ্ডবৎ।' শূদ্রই শুধু দাস নয়, সব চাকরিই দাসত্ব, এ সম্বন্ধে আমাদের কবি অবহিত ছিলেন তাই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদস্থ এক রাজকর্মচারী, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের দূত হংসবেগকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'মনস্বী মানুষ এক মুহূর্তের জন্যে হলেও মনুষ্যত্ব দেখাক ; ত্রিভুবনের রাজ্যভোগের লোভেও মনস্বীর নত হওয়া উচিত নয়।'

ভট্টির 'রাবণবধ' কাব্যে শূদ্র প্রায় অনুপস্থিত বললেই হয় ; কাহিনী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত, কাজেই অবকাশও কম। দ্বিতীয় সর্গে গোপবধূদের দধিমন্থনের বর্ণনা আছে একটি শ্লোকে (১৬)। কবি দৃশ্যটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ, মধুর সঙ্গীত ও নৃত্যের মত তালে গোয়ালিনীদের দেহসঞ্চালনের মনোরম বর্ণনা। মাঘের 'শিশুপালবধে' একটি ছোট উল্লেখ দৃষ্টি আকর্ষণ করে : কৃষ্ণ যখন সসৈন্যে যাত্রা করেছেন তখন তাঁর সৈন্যদল গ্রামবাসীদের ওপরে কোনো অত্যাচার করেনি বা কষ্ট দেয়নি (১২ / ৩৬)। এর পিছনের বাস্তব কি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাঘে পঙ্‌ক্তিপাবনের উল্লেখ পাই (১৪ / ৩৩) এবং সদ্‌ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে শুনি : খাবার সময়ে তাদের বাসনে ছোঁওয়াছুঁয়ি হয়নি (অকৃতপাত্রসংকরৈর্ভোজনৈঃ ১৪ / ৫০) রৈবতক পাহাড় শ্রেয়ান্, দ্বিজাতির মত (৪ / ৩৭)। অন্যত্রও বারে বারে দ্বিজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধের মতই উচ্চারিত, অর্থাৎ শূদ্র দ্বিজের পায়ের তলায়।

দণ্ডীর সমাজ সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল, 'দশকুমারচরিতে' সমাজের একটি বৃহৎ ব্যাসাংশ প্রতিফলিত, এতে শূদ্রের নানা বৃত্তি, নানা অবস্থা দেখা যায়। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে মাতঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণের দেখা পাই যে কিরাতদের মধ্যে বাস করেও ডাকাতি করে, ব্রাহ্মণ্য আচরণ সে বর্জন করেছে। রাজা রাজহংসের বন্ধু এক শবর রাজা এ উল্লেখও আছে।

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' পড়ে মনে হয় জাতি ও বৃত্তি যে চরিত্র নিরূপণ বা নিয়ন্ত্রণ করে না এ বোধ তাঁর ছিল। বহুতর বৃত্তির প্রতিবিম্বন এ নাটকে, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই মানুষকে বৃত্তিনিরপেক্ষভাবে ভাল বা মন্দ দেখানো হয়েছে। দুটি রাজপুরুষ (পুলিস)—বীরক ও চন্দনক ; বীরক যান্ত্রিকভাবে কর্তব্য করে,



Scanned with CamScanner

চন্দনকের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ মানবিক। শ্মশানে দুটি চণ্ডাল, গোহ ও আহীন্ত, এদের মধ্যেও একই পার্থক্য। বরং শূদ্র দাসের ক্ষেত্রে মৃচ্ছকটিকে যেন বেশি সহানুভূতি। চারুদত্তের দাস বর্ধমানক, দাসী রদনিকা,এরা প্রভুভক্ত বললে ঠিক হয় না, এরা চারুদত্তের গুণমুগ্ধ, এদের প্রতি তাঁর ব্যবহারেও সুবিচার ও মমতা প্রকাশ পেয়েছে। ধনমদমত্ত সংবাহকের আচরণ নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অমানবিক ; কিন্তু তার ভৃত্য স্থাবরকের আচরণে মহানুভবতা ও আদর্শবাদিতার পরিচয় মেলে, প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করে সে তার চরিত্রের মর্যাদা রক্ষা করেছে। এ নাটকে শূদ্র বা দুঃস্থের মধ্যে মানবিকতার অভাব কখনো ঘটেনি।

অষ্টম শতকে ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' শম্বূকবধ ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে শূদ্রের কোনো চিত্র নেই ; এ কাহিনীর উল্লেখ পূর্বেই করেছি। নবম শতকে ক্ষেমেন্দ্রের 'দশাবতারচরিতে' সাধারণ প্রজা হিসেবে শূদ্র উপস্থিত। যেহেতু এ কাব্যের উপজীব্য পৃথিবী উদ্ধারের জন্যে বিষ্ণুর মর্ত্যে অবতরণ, সেহেতু পাপক্লিষ্ট পৃথিবীর রূপায়ণ এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সপ্তম সর্গে পড়ি প্রজার উপদ্রবকারী নীচ ধূর্তরা লোকের ধন হরণ করছে, রাষ্ট্রপ্রধানেরা বিমুখ ; প্রজাদের দুঃসহ ক্লেশের সংবাদ পেয়েও তারা ঘুমোচ্ছে। বিজয়ী কায়স্থ রাজাকে করায়ত্ত করেছে, লোকের কষ্ট অবর্ণনীয় ; দুর্ভিক্ষ, অগ্নিকাণ্ড, চোর, কুমীর নানা উৎপাতে জর্জরিত তারা। (৭ / ২৮০-৮২)। ধনী বৈশ্য বিশেষভাবে প্রজাপীড়ক ; বৃত্তিজীবী শূদ্র অসহায়ভাবে বলছে : 'বেতন নিতে হাত তুলতে হয় আমাদের, প্রভুসেবায় দীন ও কৃপার পাত্র আমরা কি করব ?' (৮ / ৬৭৩)। দশম সর্গে পড়ি, ব্রাহ্মণরা ভোগী, আত্মতৃপ্তিসর্বস্ব, ক্রোধলোভপরায়ণ, তমোমূঢ়। লোকে আত্মহত্যা করছে, রজ্জু, বিষ, শস্ত্র, অগ্নি, শিলাখণ্ড কণ্ঠে নিয়ে জলমগ্ন হয়ে। ধরণী অক্ষত্রিয়া অর্থাৎ আর্ত ত্রাণের জন্যে কেউ নেই। পৌরজনের যারা রক্ষক তারাই প্রাণ ও ধন হরণ করছে, নানাভাবে প্রজাপীড়ন করছে। ক্ষমতাশালীরা দুঃখীর ক্রন্দনে বধির, মদান্ধ, ন্যায় বা বিচারের ব্যাপারে মৌনী। কায়স্থ বড়বাগ্নির মত। প্রজারা দস্যুদলিত, কোনো প্রতীকার নেই। মন্ত্রী, সেনাপতি, দৌবারিক সভাপতি ও পুরোহিত সর্বদাই উৎকোচ গ্রহণের জন্য উত্তানপাণি। বৈশ্য নির্বিষ সর্প : কৃতান্তও করুণার্ত হতে পারে, বৈশ্য কখনো সদয় হবে না ; কালকূট বিষ পান করে কিংবা খদিরকাষ্ঠের অগ্নিতে বা সন্নিপাতেও, বেঁচে থাকা সম্ভব কিন্তু বৈশ্য শত্রু থাকলে মৃত্যু অবধারিত। বৈশ্যের উৎপীড়ন স্বভাবতই শূদ্রের ওপরেই বেশি হত। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রের আক্রোশ শূদ্রদের ওপরেও : তারা এখন কেউ ক্ষত্রিয়ের মত আচরণ করে, কেউ বৈশ্যের, কেউ বা ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের মত। ব্রাহ্মণ এখন শূদ্রের দাস, শূদ্রের পায়ে প্রণিপাত করছে ব্রাহ্মণ শিষ্য—এই হল কলিবিপর্যয়, যার অনিবার্য ফল হল বর্ণসংকর (১০ / ৫-২২)।

শেষ যে গ্রন্থকারের আলোচনা করব তিনি প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ, হয়ত বা একমাত্র, ঐতিহাসিক, কল্‌হণ। একাদশ শতকে রচিত এঁর 'রাজতরঙ্গিণী'তে সম্ভবত সপ্তম থেকে একাদশ শতকের কাশ্মীরের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। কারণ কল্‌হণের পূর্বপুরুষরা কয়েক শতক ধরেই বংশানুক্রমে কাশ্মীররাজসভায় মন্ত্রিত্ব করে এসেছিলেন। পরম্পরাক্রমে আগত তাঁদের জ্ঞান ও স্মৃতিভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী কল্‌হণ। ইনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থায় ও



Scanned with CamScanner

ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজা মিহিরকুলের মৃত্যুর পরে দৈববাণী হল যে 'তিন কোটি মানুষকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন তিনি ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করে', তাই মৃত্যুর পরে তিনি পাপমুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করেছেন (১ / ৩১১)। রাজা যশস্কর হীনজাতীয়া নারীর সন্তান,কিন্তু তিনি সৎ ছিলেন বলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা তাঁকে রাজা করেন। রাজা হয়ে তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম নতুন করে প্রবর্তন করেন (৩ / ১০)। রাজপ্রাসাদে আগুন লাগল ; কল্‌হণের মন্তব্য : 'ডোমচণ্ডালের সংসর্গে দূষিত রাজাদের পাপ পুড়ে গেল' (৬ / ১৯২)। রাজা হর্ষদেবের অন্তঃপুরে ৩৬০টি অন্তঃপুরিকা, ডোম ও চণ্ডাল বাদে সব জাতের মেয়ে ছিল, অর্থাৎ শূদ্রাও বিস্তর ছিল। কঠোর বর্ণাশ্রমধর্ম থাকা সত্ত্বেও কলহণের বিবরণে অপরাধী ব্রাহ্মণের দণ্ড মধ্যে মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে, সম্ভবত ব্রাহ্মণকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে। রাজা যশস্করের আমলে এক অপরাধী ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় দণ্ডের কথাও আছে : তার কপালে কুকুরের পায়ের ছাপ দেওয়া হয়। অবশ্য দণ্ডিত ব্রাহ্মণের আত্মীয়রা অচিরেই অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা রাজার প্রাণনাশ করে ! ব্রহ্মশাপ ইত্যাদি বারেবারে ব্যবহৃত হয়েছে ব্রাহ্মণের ইষ্টসিদ্ধির জন্যে। কল্‌হণের লেখনী সবচেয়ে বিষাক্ত কায়স্থদের বিবরণে : তারা হীনজন্মা, স্বার্থসর্বস্ব, কুটিল, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর।

সাধারণ প্রজা অর্থাৎ শূদ্র, কিছু বৈশ্যও হয়ত, কল্‌হণের বিবরণে বেশ স্পষ্টভাবেই প্রত্যক্ষ। রাজার প্রাথমিক কর্তব্য যে এই উৎপাদক শ্রেণীর রক্ষণাবেক্ষণ এ বিষয়ে কল্‌হণ সতত অবহিত। এক অত্যাচারী রাজা নিষ্ঠুর শোষণ ও রাজস্ব আদায়ের দ্বারা তিন বছরের মধ্যেই প্রজাকে সর্বস্বান্ত করে দিলেন, যেমন শীতকাল গাছের সমস্ত ফল হরণ করে (৪ / ৬২৮)। চণ্ডালীর কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে সুয্য রাজা হলে বিতস্তা নদী কাদায় মজে গেল ; রাজা এক এক করে মোহর নদীতে ছুঁড়তে লাগলেন, লোক কুড়িয়ে নিতে নেমে উঠে এল সারা গায়ে প্রচুর কাদা মেখে ; নদী আবার স্রোতস্বিনী হল ; তারপর থেকে রাজা নিয়মিত জলনিঃসারণের ব্যবস্থা করলেন যেন আশপাশের চাষিদের খেতগুলো জল পায়। কাশ্মীরি তাঁতির তাঁতশিল্প এবং পশুবাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও খ্যাতির কথা পড়ি (৫ / ১৬২) ; অনুমান করা অসংগত হবে না যে তখনো তাঁতির নিজস্ব সমৃদ্ধির মান নিচুই ছিল, মধ্যবর্তী বণিকই নিত সিংহভাগ। অগ্নিকাণ্ডে সমস্ত সঞ্চিত শস্য পুড়ে যাওয়ার ফলে যে দুর্ভিক্ষ হয় তার বিবরণ আছে (৮ / ১২০৬)। অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলে পর খারি ধান বিক্রি হতে লাগল ১০০০ দীনারে ; মন্ত্রীরা উত্তরোত্তর ধনী হল গরিবদের কাছে চড়া দামে ধান বিক্রি করে (৫ / ২৭৪)। আর একটি দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গে বলেছেন খারিধান, দ্রাক্ষারস, পশম, নুন, গোলমরিচ ও হিং-এর দাম সাংঘাতিক বেড়ে গেল (৭ / ১২২০-২১) ; এগুলি সবই সাধারণ লোকের নিত্যব্যবহার্য বস্তু। কাশ্মীরের ইতিহাসে রাজপরিবারে বর্ণসংকর বারে বারেই ঘটেছে, কল্‌হণ সখেদে তার উল্লেখ করেছেন। এক গানের জলসায় এল দুটি ডোম্বী, রাজা প্রেমে পড়লেন, ঘটল বর্ণসংকর। সভায় নীচজাতীয় গায়ক 'রঙ্গ' অশ্লীল গানে রাজার চণ্ডাল রানী ও রক্ষিতাদের নামে গান বেঁধে গাইল (৫ / ৩৯১)। ডোম্বীগমনের পাপ খণ্ডাতে রাজা শুদ্ধাচারিণী এক ব্রাহ্মণীকে ধর্ষণ করলেন



Scanned with CamScanner

(৫ / ৪০২)। অধম ব্রাহ্মণেরা সে রাজার দান ও অন্ন গ্রহণ করত। রাজা কলশের মৃত্যুর পরে মহিষী কয্যা সহমরণে গেলেন না, হীনজাতীয় এক শ্রমিকের প্রতি আসক্ত হলেন, কল্‌হণের মন্তব্য, 'তাতে আমাদের দুঃখ হয়' (অতো দুঃখাকরোতি নঃ ৭ / ৭২৭)।

কাশ্মীরে এক বিশেষ ধরনের রক্ষণশীলতা ছিল ; উপত্যকার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও যেমন এসেছিল, তেমনি উত্তরপশ্চিম বাণিজ্যপথ ধরে বহু জাতির আনাগোনা ছিল বলে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পর্কে এক সদাসতর্ক মানসিকতাও ছিল। ব্যতিক্রম ঘটত বিস্তর, কল্‌হণ অপ্রসন্নচিত্তে তার বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু বারেবারেই বিলাসী স্বার্থসর্বস্ব রাজার নিন্দা করেছেন যাঁরা দুঃখী প্রজার কথা ভাবেননি। ধর্মকর্ম করা, অর্থাৎ মঠমন্দির, কূপপুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেছেন যখন রাজা সাধারণ প্রজার দুঃখ দূর করেছেন। তারা যে কত অসহায়, কত নিঃস্ব, তার বহু চিত্র 'রাজতরঙ্গিণী'তে পাই। রাজসভাসদ্ মন্ত্রিপুত্র কল্‌হণ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গোটা কাশ্মীর উপত্যকা পর্যটন করেছেন, এই পর্যটনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাজ্য জুড়ে দুঃখী প্রজার আর্তি।

নারীর ক্ষেত্রে সাহিত্যশিল্পীর, ব্যক্তিগত কল্পনার স্বাধীনতা হয়ত কিছু বেশি ছিল, কারণ নারী প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তবে অন্যদিকে নারীর স্থান সমাজে ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। নারী সম্বন্ধে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ছকটি হল : তার প্রাথমিক পরিচয় গৃহিণী ও জননীরূপে, পুত্রের জননীরূপে তার সার্থকতা। তার সামাজিক মূল্য বংশপরিচয়, বশংবদতা, সেবাপরায়ণতার ওপরেই নির্ভর করত। কিন্তু সাহিত্যে এবং জীবনে তার ব্যক্তিগত মূল্য নিরূপিত হত তার রূপ ও যৌবনের দ্বারা। যা তার কাছে প্রত্যাশিত নয় বরং যা সমাজের দৃষ্টিতে দোষাবহ তা হল তার বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বতন্ত্র চিন্তার ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব। এই ছকটি বেদাঙ্গ থেকে মহাকাব্য ও পুরাণগুলিতে পরিব্যাপ্ত ; দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এর ব্যত্যয় নেই বললেই চলে।

কালিদাসের কিছু পূর্বেই হয়ত ভর্তৃমেণ্ঠ তাঁর 'হয়গ্রীববধ' কাব্য রচনা করেন। সেখানে অন্ধ্র নারীর বর্ণনা হল, সে মধুরবচনা, নীবীবিস্রংসিনী, কম্পিতভ্রূলোচনা (৫৬৪) ; গ্রাম্য নারী মধুরবদনা, পল্লবাধরা, স্বতঃস্ফূর্ত তার উচ্চহাসি, যার বিনিময়ে গোটা রাজ্যই দিয়ে দেওয়া যায় (৫৭৬)। ঐ সময়ের নাট্যকার ব্রহ্মযশার, পুষ্পদূষিতকে একটি উপাখ্যান আছে : বণিক সমুদ্রদত্ত বিদেশে ছিল, অল্প সময়ের জন্যে দেশে ফিরে গোপনে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়। তার পিতা সাগরদত্ত শুনলেন পুত্রবধূ নন্দয়ন্তী সন্তানসম্ভবা এবং গোপনে কোনো পুরুষ তার সঙ্গে দেখা করেছিল। শ্বশুর তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। এক শবর সেনাপতি তাকে আশ্রয় দেয়। দেশে ফিরে সমুদ্রদত্তের সন্দেহ যায় না সন্তানের পিতৃত্ব সম্বন্ধে ; অবশেষে শবর সেনাপতির দৃঢ় যুক্তিতে সংশয়ের নিরসন হল। দুটি মূল ব্যাপার এ কাহিনীতে বিধৃত : সম্পত্তিমানের সন্তানের পিতৃত্ব সম্বন্ধে সংশয় এবং এর ফলে নারীকে অসতী সংজ্ঞা দিয়ে নির্যাতন করা। মনে রাখতে হবে, এদেশে সতীর কোনো সমার্থক পুংলিঙ্গ শব্দই ছিল না।

'ঋতুসংহার' সম্ভবত কালিদাসের কিশোর বয়সের রচনা, নারী এখানে



Scanned with CamScanner

নিতান্তই গৌণ, তার সাধারণ চিত্রটি ভোগ্যবস্তুরই চিত্র। 'কুমারসম্ভবে' প্রেমের সাধনা, কিন্তু সে আমাদের শিবরাত্রিরই এক বিলম্বিত কৃচ্ছ্রসাধনের সংস্করণ : মনের মত স্বামী পাবার সাধনা, যার বহু উপাখ্যান মহাকাব্যে ও পুরাণে মেলে। পার্বতীর সাধনায় শিবের টনক নড়ল ঠিকই, কিন্তু পার্বতীকে পাবার জন্যে তাঁর দিকে কোনো তপস্যার প্রয়োজন ঘটেনি। এর মর্মবস্তু যে প্রেমের আলেখ্যটি, কাব্য বিচারে সেটি অত্যন্ত মূল্যবান্, কিন্তু এর উপজীব্যটি চিরাচরিত সংস্কারেরই অনুগামী। 'মেঘদূতে' প্রেমিক প্রেমিকা দুজনেই দুঃখভোগ করেন ; যদিও এখানে দুঃখের নিমিত্ত পুরুষ, ফলভাগিনী নিরপরাধা যক্ষবধূও। প্রেমে এখানে দেহমন দুয়েরই স্থান আছে, যদিও দেহই মুখ্য। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' প্রৌঢ় রাজা অগ্নিমিত্র,যাঁর পিতা ও পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে, তিনি কন্যার বয়সিনী এক সুন্দরী তরুণীকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। ইরাবতী ও ধারিণী দুই সপত্নী প্রাণপণে ষড়যন্ত্র করে চললেন যাতে রাজা মালবিকার সঙ্গে মিলিত হতে না পারেন। অবশেষে জানা গেল, মালবিকা রাজকন্যা, মহিষী ধারিণীর আত্মীয়া এবং এর সঙ্গে মিলনে রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল হবে। তৎক্ষণাৎ ধারিণী নিজে উদ্যোগ করে বিয়েটা দিয়ে দিলেন ; অর্থাৎ প্রেমের প্রতিবন্ধকতা ভেসে গেল জ্যোতিষীর গণনার সামনে। প্রেমের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গৌণ হল রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের কাছে ; সেই পণ্যদ্রব্য পরিচয়ই মুখ্য হল নারীর। তবে নাট্যকার তো স্বয়ং কালিদাস, তাই এ নাটক প্রথমদিকের রচনা হলেও এর মধ্যে মুন্সিয়ানা যথেষ্ট এবং মালবিকার অসহায় প্রেম মাঝেমাঝে পাঠককে অভিভূত করে। 'বিক্রমোর্বশীয়ে' সমস্যা জটিলতর। রাজমহিষী ঔশীনরী ও রাজা পুরূরবার প্রেমের দৃঢ় ভিত্তি ছিল। হঠাৎ দেখা দিল স্বর্গের স্বপ্নসুন্দরী উর্বশী, গৌণ্ হয়ে গেল পুরাতন প্রেম যা গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। কালিদাস কোথাও ঔশীনরীর রূপবর্ণনা করেননি, একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে উদ্‌ঘাটন করেছেন তাঁর চরিত্র। রাজা উর্বশীতে আসক্ত জেনে তিনি এক জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় রাজাকে প্রাসাদশীর্ষে ডেকে পাঠালেন প্রিয়-প্রসাদন ব্রত উদ্‌যাপন করবেন বলে। মাঙ্গল্য উপচার সামনে রেখে বললেন, 'রোহিণী ও শশাঙ্ককে সাক্ষী রেখে আর্যপুত্রকে প্রসন্ন করতে বলছি : আজ থেকে যে নারীকে আর্যপুত্র কামনা করবেন এবং যে নারী আর্যপুত্রের সমাগমপ্রার্থিনী হবেন তাঁর সঙ্গে আমি প্রীতি বন্ধনে যুক্ত থাকব।'—একদিন ছিল যখন যে নারীকে আর্যপুত্র কামনা করতেন তাঁর নাম ছিল ঔশীনরী। সেদিন গেছে, আজ ঔশীনরীর আত্মসম্মানবোধ তাঁকে দিয়ে এই কথা বলাচ্ছে, যেন গোপন প্রেমের অনাবশ্যক জটিলতা ও গ্লানি থেকে মুক্তি পান পুরূরবা। সম্পূর্ণ নেপথ্যে চলে গেলেন ঔশীনরী, নাটক থেকে মুছে গেলেন। রয়ে গেল কালিদাসের হাতে-আঁকা অনাদৃতা নারীর আত্মসম্মানরক্ষার এক আলেখ্য।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' সমস্যা গম্ভীরতর। শকুন্তলা আশ্রমে লালিতা, কিন্তু তাঁর বিবাহ হয়েছে রাজার সঙ্গে, অতএব সমাজ তাঁর কাছে প্রত্যাশা করে যে সাধারণ কুলবধূর ভূমিকাতেই তাঁকে দেখা যাবে। তাই কন্যা বিদায়ের মুহূর্তে কণ্ব তাঁকে আশীর্বাদ করে উপদেশ দিচ্ছেন : 'গুরুজনদের শুশ্রূষা কোরো, সপত্নীদের সঙ্গে প্রিয়সখীর মত আচরণ কোরো। স্বামী রেগে গেলেও তুমি কখনো রেগে তার বিরুদ্ধ আচরণ কোরোনা···এই পথেই নারীরা গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হয়, এর অন্যথা



Scanned with CamScanner

যারা করে তারা বংশের ব্যাধিস্বরূপিণী' (৪ / ১৮)। বলা বাহুল্য, এ উপদেশ শুধু শকুন্তলার প্রতি নয়, পঞ্চম শতক ও পরবর্তীকালের তাবৎ নারীর প্রতিই এটি উদ্দিষ্ট। কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে বলছেন, 'কন্যা হল পরের ধন, তাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে, আজ মনটা শান্ত। যেমন শান্ত হয় মন গচ্ছিত ধন ফেরৎ দিয়ে' (৪ / ২২)। পিতৃকুলে নারী পিতার কাছে গচ্ছিত স্বামীর সম্পত্তি, বিবাহের পরে স্বামীর ব্যক্তিগত এবং শ্বশুরকুলের পরিবারগত সম্পত্তি ; নিজের ওপরে তার কোনো অধিকারই নেই। এই কথাই শুনি শার্ঙ্গরবের মুখে ; দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করলে পর সে দুষ্যন্তকে বলছে, 'একে পরিত্যাগই করুন আর গ্রহণই করুন, এ হল আপনার পত্নী, স্ত্রীর ওপরে, স্বামীর সর্বতোমুখী প্রভুত্ব আছে' (৫ / ২৬)। কিন্তু কবি কালিদাস সমাজের মন রাখার পরে, ছোট একটি কথায় শকুন্তলাকে কিছু মর্যাদা দিয়েছেন। শকুন্তলা যখন নিশ্চিত জানলেন যে দুষ্যন্ত তাঁদের প্রেম, গান্ধর্ব বিবাহ ও নিজের অঙ্গীকার সবই অস্বীকার করছেন তখন বললেন, 'সেই প্রেমের যখন এই পরিণতি তখন আর (রাজাকে) স্মরণ করিয়ে দিয়েই বা কি হবে ? তথাপি নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করতে হবে।' আর আর্যপুত্র সম্বোধন করলেন না, বললেন, 'পৌরব' অর্থাৎ 'পুরুবংশীয় রাজা' তুমি, তার মর্যাদার অনুরূপ আচরণ অপেক্ষিত তোমার কাছে'। এই নিজেকে কলঙ্ক মুক্ত করার প্রয়োজনবোধটিই কালিদাসের গৌরবময় সংযোজন ; সমাজ, রাজা, প্রেমিক, স্বামী—কেউই যার মর্যাদা দিল না তারও অধিকার এবং প্রয়োজন আছে আত্মপক্ষ সমর্থনের। 'মেঘদূতে' যেমন, এখানেও তেমনি পুরুষের দোষে দুঃখ ভোগ করল নারী। কিন্তু এটি কালিদাসের পরিণততর রচনা, তাই এখানে কালিদাসের শিল্পী দৃষ্টি সত্যতর। ষষ্ঠ অঙ্কে আত্মগ্লানি, অপরাধবোধ, জ্বালা ও অতলান্ত বিরহে ক্লিষ্ট দুষ্যন্তের যে ছবিটি এঁকেছেন কবি, তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : নারীও সাধনার ধন, তাকেও পেতে হয় দুঃখের মূল্যে।

'রঘুবংশ' একটি অসামান্য মহাকাব্য। এখানে অনেক নারী, সকলের আলোচনা সম্ভব নয়, দু-একটিরই আলোচনা করব। পুরুষের বহুপত্নীত্ব-উপমা ও উল্লেখে এ কাব্যে বারংবার উপস্থিত। লক্ষ্মী বিষ্ণুর পদসেবা করেন (১০ / ৮, স্মরণীয়, গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যেই প্রথম লক্ষ্মী বিষ্ণুর পদসেবা করেন)। নারীর অভিসারের বহু উল্লেখ এ কাব্যে এবং অন্যত্র পাওয়া যায়। অভিসারের সমস্ত ঝুঁকিটা নিতে হয় নারীকেই ; অন্ধকার রাতের সাপখোপ, বর্ষারাতের বজ্রবিদ্যুৎবর্ষণ এবং জ্যোৎস্নারাত্রে আত্মগোপন করার দায়—সবটাই নারীর। 'অভিসারী' নেই সাহিত্যে, সে নিরাপদে সংকেতস্থলে বসে থাকে, শিরে সংক্রান্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নারীই, যেন গরজ তার একারই। রঘুবংশের শেষ সর্গে ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজা অগ্নিবর্ণের অবক্ষয়ের জন্যে কালিদাস রাজাকেই দায়ী করেছেন, অন্তঃপুরিকাদের নয়। ইন্দুমতীর মৃত্যুর পরে অজ বলছেন, 'করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমাকে হরণ করে' কীই না আমার নিয়ে গেল।' লক্ষণীয়, এই বিখ্যাত শ্লোকটিতে (গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ / করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং কিং ন মে হৃতম্ ॥ ৮/৬৭) কোথাও রূপবর্ণনা নেই, বরং বধূর মানসিক সাহচর্যের কথা আছে যা সংস্কৃত সাহিত্যে একান্তই দুর্লভ। বিরহক্লিষ্ট অজের কাছে জীবন এমনই দুর্বহ বোধ হল



Scanned with CamScanner

যে তিনি ধীরে ধীরে যেন মৃত্যুবরণ করলেন। এর পূর্বে বা পরে একমাত্র বাণভট্ট ছাড়া আর কোনো কবিই নারীকে এতটা মূল্য দেননি। শুধু 'হর্ষচরিতে'র প্রথম উচ্ছ্বাসে দেখি সরস্বতী স্বর্গে ফিরে গেলে দধীচ বনে গেলেন জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে এবং পুত্রের ব্যবস্থা করে অকালে প্রাণত্যাগ করলেন।

সীতার চরিত্রচিত্রণে কালিদাসের যেন অভীষ্টই ছিল, বাল্মীকির মূল্যবোধের সমালোচনা করা। অযোধ্যায় সীতাবিসর্জনের ব্যাপারে বাল্মীকির রাম দুঃখিত, কালিদাসের রামের নৈতিক বোধ দ্বিধাগ্রস্ত ; বলছেন '(প্রজাদের মধ্যে) এই আত্মনিন্দা উপেক্ষা করব,না নির্দোষ সীতাকে ত্যাগ করব' (১৪ / ৩৪)। শেষ পর্যন্ত নির্দোষ জেনেও ত্যাগ করলেন (১৪ / ৪০)। লক্ষ্মণের কাছে বনে বিসর্জনের কথা শুনে সীতা বললেন, 'সেই রাজাকে বোলো, অগ্নিশুদ্ধ আমাকে প্রত্যক্ষ করেও লোকাপবাদে আমাকে যে ত্যাগ করলেন এটা কি তাঁর বংশের অনুরূপ হল, না তাঁর পাণ্ডিত্যের ?' (১৪ / ৬১)। পরেই অবশ্য বলছেন, 'এ নিশ্চয়ই আমার পূর্বজন্মকৃত পাপের ফল' (১৪ / ৬২)। বাল্মীকির বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর পূর্বজন্মই বা কোথায়,পাপই বা কোথায় ? কিন্তু এ হল কালিদাসের মানবী সীতা। লক্ষ্মণের কাছে সীতাবিসর্জনের সংবাদ পেয়ে 'রামের চোখে সহসা জল ভরে এল, যেন পৌষরাতের কুয়াশা-ঢাকা চাঁদ ; লোকাপরাদে তিনি সীতাকে গৃহ থেকেই নির্বাসন দিয়েছেন, মন থেকে নয়' (১৪ / ৮৪)। এ রাম একান্তই কালিদাসের সৃষ্টি, যে-কবি বোঝেন যে প্রেমের মূল্য দিতে হয়, শুধু নারীকে নয়, নারীর জন্যে পুরুষকেও।

সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ পঞ্চম শতকের শ্যামিলকের 'পাদতাড়িতক' নাটকে। এক গণিকা বিট তৌণ্ডিকোকির মস্তকে পদাঘাত করায় বিটদের সভা বসল : প্রায়শ্চিত্ত কি হবে। কেউ বলে, 'আর একবার পদাঘাত করুক মদনসেনিকা' ; কেউ বলে, 'আহা, তৌণ্ডিকোকি হল যজ্ঞের পশু, ওর মাথায় পদাঘাত করাটা ঠিক হয়নি। তৌণ্ডিকোকিই বরং প্রায়শ্চিত্ত করুক মদনসেনিকার পা ধুইয়ে দিয়ে।' কেউ বা বলে 'সেই পা-ধোওয়া জলে ও নিজের মাথাটা ধুয়ে নিক্।' কেউ বলে, 'মাথার ঐ অংশটা কামিয়েই ফেলুক।' এই কথাটা তৌণ্ডিকোকির মনে ধরে, কিন্তু তার মনে হয় কামিয়ে ফেলা যথেষ্ট নয়, মাথাটা কেটে ফেলাই বিধেয়। শেষ পর্যন্ত সভাপতি বিধান দেন : মদনসেনিকা ওর সুন্দর পা দুটি দিয়ে পুনর্বার আঘাত করুক তৌণ্ডিকোকির মাথায়! দেখা যাচ্ছে গণিকালয়ের পরিবেশে অনেকটা যেন স্বাভাবিকভাবে দেখা হয়েছে নারী পুরুষের আপেক্ষিক সম্পর্ক অর্থাৎ নারীমাত্রই পুরুষমাত্রের চেয়ে হীন, এ বোধটা নেই। অবশ্য গণিকার এক নামই স্বতন্ত্রা।

'অমরুশতকে' নারী প্রেমিকারূপে নানাভাবে চিত্রিত। প্রেমে নারীর কিছু স্বতন্ত্র স্থান দেখানো হয়েছে, কখনো-বা পুরুষ অসহায় তার সামনে। মান ও মানভঞ্জনের ক'টি পদে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু মনে হয় অমরুর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হল প্রেমের মৃত্যু দেখানো ; শীলা ভট্টারিকার একটি পদ্য-এবং সংকলনগ্রন্থে বিক্ষিপ্ত কিছু শ্লোক বাদ দিলে আর কোনো কবির লেখনী এটা দেখাতে সাহস পায়নি। অমরুতে নায়িকা বলছে, 'আমাদের সেই প্রেমের এ কী করুণ মৃত্যু ! সেই তুমিই পায়ে ধরে সাধছ, আমার মন তাও গলছে না তো !'



Scanned with CamScanner

শীলা ভট্টারিকার সেই অমর শ্লোকটিতে নারী বলে, 'যে আমার কৌমার হরণ করেছিল, সে-ই আজ আমার বর ; সেই চৈত্ররজনী, তেমনি ফুটে আছে মালতী ফুল, কদমের সুরভি নিয়ে তেমনি বইছে বাতাস। সেই আমিই আছি, তবু আজ প্রিয়মিলনের ক্ষণে রেবাতটের বেতসকুঞ্জে প্রাণ কেন উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে ?'

ষষ্ঠ শতক থেকে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে সাহিত্যে নারীর চিত্র স্থূল রেখায় আঁকা, এ চিত্র ভোগ্যবস্তুর। ভারবির 'কিরার্তাজুনীয়ে' ষষ্ঠ, সপ্তম সর্গে নিতান্ত অনাবশ্যকভাবে অপ্সরাদের আনা হয়েছে। এদের ছলাকলা হাব-ভাব সবই বাৎস্যায়ন-বর্ণিত গণিকার আচরণ : জলকেলি, বনবিলাস সবই আছে এতে, অর্থাৎ অপ্সরাদের অন্য নাম যে স্বর্গবেশ্যা সেটাই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ ছবির রং চড়া এবং নারীর দেহ ও বিলাসবিভ্রমের বর্ণনাই মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু। এই শতকেরই শেষে এক অত্যন্ত অপকৃষ্ট রচনা সুবন্ধুর গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা'। বাসবদত্তা ও কন্দর্পকেতু পরস্পরকে স্বপ্নে দেখে ব্যাকুল হলেন। নায়ক বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন স্বপ্নদৃষ্টার সন্ধানে, নায়িকা তমালিকা নামে এক সারিকাকে পাঠালেন নায়কের খোঁজে। ক্রমান্বয়ে অবাস্তব ঘটনাবলীর অন্তে দুজনের যখন দেখা হল তখন নায়ক নায়িকার সঙ্গে একটি কথাও না বলে তাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নায়িকার আচরণ আগাগোড়াই সম্পূর্ণ যান্ত্রিক : সুপ্রচুর হা-হুতাশ, আত্মহত্যার সংকল্প, নির্দিষ্ট সময়ে মূর্ছা ইত্যাদি অলঙ্কারশাস্ত্রে যেমনটি নির্দেশ দিয়েছে ঠিক তেমনই। বলে রাখা ভাল, অধিকাংশ নায়িকাই হুবহু এই ছকেই নির্মিত।

সপ্তম শতকে বাণভট্টের 'কাদম্বরী'-তে কাদম্বরী ও মহাশ্বেতাও এই ছকে নির্মিত। বাণভট্টে বরং দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্য নারীরা। নায়িকা বা রাজ-অন্তঃপুরের গণিকারা ছাঁচে ঢালা চরিত্র ; কিন্তু রানী বিলাসবতীর সহচারিণী বৌদ্ধ প্রব্রাজিকা একটু অন্যরকম ; তিনি বই পড়েন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন ; অবিবাহিতা শিক্ষিতা এই স্বাধীন রমণীর আসন অন্তঃপুরিকাদের শ্রদ্ধায়। আর আছে কুলূতরাজকন্যা পত্রলেখা। এই একটিবার মাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে তরুণ কুমার রাজপুত্রের একটি কুমারী তরুণী বান্ধবী ও সহচরী। রানী বিলাসবতী চন্দ্রাপীড়কে বলছেন, 'দেখিস, এর যেন অনাদর করিসনে। এ আমার বড় আদরের মেয়ে। একে বালিকার মত আদর করবি, নিজের চিত্তবৃত্তির মত চাপল্য থেকে রক্ষা করবি, শিষ্যার মত দেখবি, বন্ধুর মত সমস্ত গোপন কথা জানাবি।' এই মেয়ে দিনেরাত্রে রাজপুত্রের কাছেকাছে থাকে; দুজনের পরস্পরের প্রতি গভীর সম্প্রীতি জন্মাল। অকুণ্ঠ বর্ণনা সেই প্রীতির, সত্যিই কামগন্ধ নাহি তায়। অথচ পত্রলেখা রাজকন্যা, নবযৌবনা। এই চিত্রটিতে বাণভট্টের লেখনী অদ্ভুত এক সংযমের পরিচয় দিয়েছে। পত্রলেখা চন্দ্রাপীড় থেকে অভিন্নহৃদয়া, তাঁর দেহবহির্ভূত নিঃশ্বাসবায়ু, দ্বিতীয় প্রাণ। রাজপুত্র প্রেমে পড়লে সে তাঁর দূতী হয়ে কাদম্বরীর কাছে যায়। দুজনকে আশ্বাস দেয়, মিলনে সহায়তা করে। কাদম্বরীর সংবাদ নিয়ে, সে যখন প্রাসাদে এল তখন চন্দ্রাপীড় তাকে জড়িয়ে ধরলেন, সকলকে সরিয়ে তার হাত ধরে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। অথচ বর্ণনাটি নিতান্তই সখা ও সখীর, মনেরই সম্পর্ক। মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকের আচরণের মধ্যেও পর্দার কোনো আভাস নেই। পুণ্ডরীকের বন্ধু কপিঞ্জল নির্জনে একা মহাশ্বেতার সঙ্গে



Scanned with CamScanner

দীর্ঘকাল আলাপ করে, মহাশ্বেতা সখী তরলিকাকে সঙ্গে নিয়ে একা অভিসারে বনের মধ্যে নিরালা এক মন্দিরে যান, এবং সেই অচ্ছোদসরসীতীরের মন্দিরে একা অনাত্মীয় চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে গল্প করেন। ক্লান্ত হলে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েন পল্লবশয্যায়। চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার সঙ্গে সখীর কাছে গেলে পর কাদম্বরীর পিতৃগৃহে কন্যান্তঃপুরে গীতবাদ্যশিল্পের পরিবেশে পরিহাসে কৌতুকে আলাপ জমে ওঠে। অন্তঃপুরকাননেরই রত্নহর্ম্যে চন্দ্রাপীড় রাত্রিযাপন করেন। ভাবতে অবাক লাগে সপ্তম শতকের রক্ষণশীল সমাজের রাজকবি নির্ভয়ে এমন বর্ণনা পড়ছেন রাজসভায় বসে : নারীপুরুষের সখ্য ; সহজ, মুক্ত আলাপ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য। সৌন্দর্যের রম্য পরিবেশে যৌবন ও প্রেমের স্ফুরণের অকুণ্ঠিত, নির্মল ও অম্লান ক'টি আলেখ্য। 'হর্ষচরিতে' রাজকুমার দধীচের দূতী কুমারী তরুণী মালতী একা ঘোড়ায় চড়ে শোণ নদী পেরিয়ে আসে সরস্বতীকে রাজপুত্রের প্রেম ও আগমনবার্তা শোনাতে। এ কি সপ্তম শতকের ভারতবর্ষ, না রাজার প্রিয় কবি তাঁর সমস্ত স্বাধীনতা প্রয়োগ করে একটি চিরন্তন আদর্শ কল্পলোক নির্মাণে উদ্যত ? অথচ অন্যত্র সামাজিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে সতর্ক নিষ্ঠা ছিল বাণভট্টের : বিধবা হবার ভয়ে রানী যশোমতী আত্মহত্যা করেন। বিধবা রাজ্যশ্রী মালবরাজের কারাগার থেকে পালিয়ে যান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিবাকরমিত্রের আশ্রয়ে। বারাঙ্গনারা রাজসভার অলঙ্কার ; তারা রাজাকে স্নান করিয়ে দেয় ও নানাভাবে পরিচর্যা করে। খণ্ডকাব্য 'চণ্ডীশতকে' বাণভট্টের প্রতিপাদ্য হল, পুরুষ দেবতারা মহিষাসুরের সামনে নিষ্প্রভ, নিষ্পরাক্রম, পরাজিত ও হৃতদর্প ; চণ্ডিকা একক বিক্রমেই মহিষাসুরমর্দিনী। সমস্ত বাণভট্ট পড়ে মনে হতে থাকে নারীপুরুষের সামাজিক স্থানবিন্যাসে তাঁর সংবেদনশীল কবিচিত্ত স্বস্তি পায়নি, তাই তিনি আরও সহজ,আরও স্বাভাবিক এক সমাজকে এঁকে গেলেন। যা ঘটছিল তাকে উপস্থাপিত করার পর বললেন, 'কি হওয়া উচিত, কি হতে পারত তাও দেখ।' অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।

এই শতকেরই শেষদিকে রচিত রাজা শ্রীহর্ষের তিনটি নাটক—'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'নাগানন্দ' ; এগুলিতে নারী প্রচলিত সব ভূমিকাতেই দেখা দিয়েছে—নায়িকা, দূতী, গণিকা, সখী, সপত্নী—কিন্তু সব ক'টি নারীরই আচরণ যান্ত্রিক, বৈশিষ্ট্যবর্জিত। তেমনই ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' ; সেখানে অন্তঃপুরে মহিষী ভানুমতীর করস্পর্শ দুর্যোধনকে বিচলিত করে তোলে, যুদ্ধক্ষেত্রে তখন যুদ্ধ চলছে। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রলোভিকার ভূমিকা। ভর্তৃহরির 'শতকত্রয়' (বা 'ত্রিশতী')-এও, বিশেষত, 'শৃঙ্গারশতকে' সেই ছবিটিই পাই : স্মিতহাসিতে, লজ্জাভয়ে, মুখ ফিরিয়ে অর্ধকটাক্ষের চাহনিতে, কথায়, ঈর্ষ্যাকলহে ও লীলায়—সমস্তভাবেই নারী পুরুষের বন্ধন (১)। নারী নরকের দ্বার, প্রলোভন ও পতনের হেতু। কিন্তু ভর্তৃহরি নারীকে মোহিনী ও সুন্দরী ছাড়াও অন্যভাবেও দেখেছেন। প্রকৃত প্রেম অমৃতনিষেকে জীবনকে সঞ্জীবিত করে, নারীর ভূমিকা সেখানে আশীর্বাদের মতই। 'মিলনে সে অমৃতলতা, অপ্রসন্ন হলে বিষবল্লরী' (৪৪)। 'এ সংসারে কুনৃপতির ভবনদ্বারে প্রভু-সেবায় নিরত মনকে মনস্বী কেমন করে ধারণ করত যদি জ্যোৎস্নাপুঞ্জের মত এই পদ্মনেত্রা নারীরা না থাকত ?' (৩১)। 'সংসার, তোমার প্রান্তদেশ অনেক



Scanned with CamScanner

দূরে—মধ্যের ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠত যদি এই মদিরেক্ষণারা না থাকত' (৩৮)।

মাঘের 'শিশুপালবধ' কাব্যে কিন্তু নারী শুধুই সুন্দরী যুবতী এবং প্রকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু। সেখানে নায়িকা, প্রতিনায়িকা (বা প্রতিযুবতী), দূতী, বারাঙ্গনা, জলকেলি, কাননবিহার ইত্যাদির সুদীর্ঘ প্রথাসিদ্ধ বিবরণ আছে বাৎস্যায়নের নির্দিষ্ট ছকে। নারী সুরাপান করে—কপিশায়ন, পরিস্রুৎ, বারুণী, মৈত্রী, হালা, মৈরেয় ইত্যাদি বহু নাম পাই সুরার। সহমরণের যুক্তি দেওয়া হয়েছে : সহমৃতা না হলে পরজন্মে ঐ পতি পাওয়া যাবে না (৯/১৩) ! গণিকাকেও বারবার দেখা গেছে মাঘে, তার ক্রূর, লুব্ধ ভূমিকায়। এই একই চিত্র পাই দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতে', নারী সেখানে কুলকন্যা, কুলবধূ বা গণিকা। দণ্ডীর দৃষ্টি বাস্তবমুখী, মোহবিমুক্ত, তাই নানা সামাজিক পরিবেশে এদের দেখা পাওয়া যায়।

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে নারী কুলবধূ ও গণিকা এই দুই ভূমিকাতেই আছে। কুলবধূ নেপথ্যচারিণী ধৃতা স্বামিগর্বে গর্বিতা, সামাজিক পরিচয়েই তাঁর আসন দৃঢ়, সেখান থেকে তিনি গণিকা বসন্তসেনার প্রদত্ত মুক্তামালা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আর্যপুত্রই আমার আভরণ'। নাটকের শেষে চারুদত্তের প্রেম এবং বসন্তসেনার মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে—এবং কতকটা নিরুপায় হয়েও—বসন্তসেনাকে সপত্নীরূপে স্বীকার করেন। বসন্তসেনা গণিকা, চারুদত্তের প্রতি গভীর প্রেমে তাঁর জীবনে নবজন্ম ঘটেছে, সেখানে তিনি গণিকা থেকে প্রেমিকার ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি চারুদত্তের গুণমুগ্ধা ; চারুদত্ত তাঁর রূপে মুগ্ধ, তবু তাঁর দৃষ্টি রূপকে অতিক্রম করে বসন্তসেনার মনটিকেও দেখতে পেয়েছিল। কাহিনী প্রাচীন, সেখানে শূদ্রকের কৃতিত্ব নয়, তাঁর কৃতিত্ব গণিকার প্রেমকে তাঁর চরিত্রের মহিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করায়।

নারীচরিত্রচিত্রণে বোধহয় ভবভূতির বৈশিষ্ট্যই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। 'মালতীমাধব' নাটকে রাজাকে তুষ্ট করবার জন্যে মালতীর পিতা তাকে অপাত্রে সম্প্রদান করতে উদ্যত শুনে মালতী বলে, 'বাবার কাছে রাজার তুষ্টিই বড় হল, মালতী কিছু নয় ?' যুগে যুগে অসংখ্য মেয়ের এই নালিশ একবার তো ভাষা পেল সাহিত্যে। 'উত্তররামচরিতে' ভবভূতি সচেতনভাবে বাল্মীকি রামায়ণে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলির পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। এখানে দ্বিতীয় অঙ্কে সীতা রামের বিষয়ে স্পষ্টই বলেন, 'যিনি অকারণে আমাকে পরিত্যাগ করেছেন', 'অন্যায়ভাবে আমাকে বনে পাঠিয়েছেন'। তাঁর সখী বাসন্তী রামকে বলেন, 'লোকে বলে, যশ আপনার প্রিয়, কিন্তু যশোবিরোধী এমন ভয়ঙ্কর কাজ আর কি হতে পারে ?' (৩ / ২৭) তমসা সীতাকে বলেন, 'তিনি (রাম) নিজেই যখন তোমাকে ত্যাগ করেছেন, তখন শুধু অশ্রুবর্ষণে তাঁর সান্ত্বনা পাওয়া কঠিন।' রামচন্দ্রকে সীতার অরণ্যসহচরী সীতাপরিত্যাগ নিয়ে ধিক্কার দিয়ে বলেন : 'তুমি তাকে বলতে—তুমি আমার প্রাণ, আমার দ্বিতীয় হৃদয়, নয়নের জ্যোৎস্না তুমি, অঙ্গের অমৃত। এইসব শতশত প্রিয়বচনে সেই মুগ্ধাকে অভিভূত করে, তাকেই—থাক্, আর বলেই বা কি হবে ?' (৩ / ২৬) শুধু অন্যান্যদের ভর্ৎসনাই নয়, ভবভূতি স্বয়ং রামকে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হতে দিয়েছেন। সীতাকে



Scanned with CamScanner

নির্বাসন দেবার সিদ্ধান্ত নেবার পর কোলে নিদ্রিতা সীতার দিকে চেয়ে রামচন্দ্র বলছেন, 'শৈশব থেকে লালন করেছি যে প্রিয়াকে, বন্ধুত্বে যার সঙ্গে আমি অভিন্নহৃদয়, সেই প্রিয়াকে ছলনা করে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিচ্ছি, এ যেন গৃহপালিত বিহঙ্গীটিকে নিয়ে চলল শিকারি' (১ / ৪৫)। বলছেন, 'অস্পৃশ্য আমি, সীতাকে স্পর্শ করে দূষিত করছি।' কোলে নিদ্রিতা সীতার উদ্দেশে বলছেন, 'অকর্ম করায় পটু চণ্ডাল আমি, অয়ি মুগ্ধে ত্যাগ কর আমাকে ; চন্দনতরুভ্রমে তুমি দুর্বিপাক বিষদ্রুমকে আশ্রয় করেছ' (১ / ৪৬)। এ নাটকে ভবভূতি অনেক নারীচরিত্র উদ্ভাবন করেছেন : তমসা, মুরলা, ভাগীরথী, পৃথিবী, আত্রেয়ী, বাসন্তী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি। এঁদের সকলেরই সহানুভূতি সীতার প্রতি ; ফলে রামের নিষ্ঠুরতা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। নাটকের শেষ অঙ্কে রামসীতার পুনর্মিলন হয়ত শুধু 'বিয়োগান্তং ন নাটকং' এ নির্দেশের বশেই নয় ; হয়ত সমাজের কাছে বারেবারে দুর্বিচার পেয়েছেন যে সীতা তাঁকে ফিরে কিছু সুখ দেবার বাসনায় বাল্মীকির কাহিনীকে তিনি অন্যধারায় প্রবাহিত করেছেন। নাটকের শুরুতেই সূত্রধার বলছেন, 'যেমন নারীর, তেমনই ভাষার সাধুত্ববিষয়ে মানুষ দুর্জন' (১ / ২)। নট শুধরে দিয়ে বলছেন, 'বল, অতি দুর্জন'। এই চিরাচরিত অন্যায়ের কিছু প্রতীকার যেন এ নাটকের একটি উদ্দেশ্য। নাটকের অন্তে ভরতবাক্যে ভবভূতি বলছেন, 'জগতের মাতার মত, গঙ্গার মত মাঙ্গলিক ও মনোহরা এই কথা, যার রূপ অভিনয়ে বিন্যস্ত হল। এই কথা পাপ থেকে উদ্ধার করুক, শ্রেয়কে বর্ধিত করুক। পরিণতপ্রজ্ঞ শব্দব্রহ্মবিৎ বাল্মীকির এই বাণী পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে চিন্তা করুন'। (৭ / ২০) রামায়ণকাহিনী প্রাচীন, পরিণতপ্রজ্ঞ কবি এখানে ভবভূতি, 'স্বয়ং সরস্বতী যাঁকে দাসীর মত অনুগমন করেন', (১ / ২) তাঁরই লেখনীতে এই প্রাচীন কাহিনী যে-নবরূপ পরিগ্রহ করেছে তার প্রতিই কবি পাঠক ও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। রামসীতার কাহিনী যে সামাজিক দুর্বিচারের চিহ্ন বহন করে, পরিমার্জনার দ্বারা তার একটি মনন-শোধিত রূপ উপস্থাপিত হয়েছে এ-নাটকে, তাই এ-কাহিনী মাতার মত, গঙ্গার মত, মাঙ্গলিক ও মনোহরা।

কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে নারী ভাল মন্দ দুই রূপেই চিত্রিত, সেখানে নারীর নানা পরিচয় : রাজ্ঞী, উপপত্নী, গণিকা, কুট্টনী, দেবদাসী, অবরুদ্ধা (বা রক্ষিতা) কুলবধূ, মাতা। সমাজের মূল্যবোধ রক্ষণশীল : পতিই নারীর দেবতা, সতীত্ব একটি পবিত্র ব্যাপার। সতীর তেজও বিঘোষিত হয়েছে সরবে : 'সতী, দেবতা ও ব্রাহ্মণের কোপে ত্রৈলোক্যেও বিপ্লব হয়।' (১ / ২৭২)। নারী ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্যেই (৩ / ৫১) ; নারী স্বভাবতই চঞ্চল, কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে ? (৩ / ৫১৮, ৫১৯) নারী সুরাপান করে, অত্যাচারী রাজা নিরপরাধা নারীর অঙ্গহানি ও গর্ভপাত ঘটায়, রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ইষ্টসিদ্ধির জন্যে প্রয়োজনমত নারীকে ডাইনি বলে অত্যাচার করা হয়। থেকে থেকেই কল্‌হণ নারীনিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। রাজা ডোম্বীর প্রতি আসক্ত হওয়াতে রাজ্য অশুচি হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য বণিক গোম্‌পা-র স্ত্রীকে কামনা করলে বণিক স্ত্রীদান করতে চান। রাজা অসম্মত হলে বলে, 'মন্দিরে দেবদাসীরূপে দান করছি, সেখান থেকে নিয়ে নিন' (৪ / ৩৬)। নারীক্রয়ের সংবাদ শুনি : তুরস্ক বণিক বহু দেশ থেকে নারী



Scanned with CamScanner

সংগ্রহ করে বিক্রি করত (৭ / ৫২০)। কল্‌হণ অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে সহমরণে সতী হওয়ার বিবরণ দেন ; এক স্ত্রী সহমরণে যাননি, তার প্রভূত নিন্দাও করেন (৮ / ২/ ৩৪৩)। ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতির যুগের মূল্যবোধকেই সমর্থন করেছেন কল্‌হণ ; তবে কোনো রাজা ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে অনাচারী হলে কল্‌হণ রাজাকেই দোষ দিয়েছেন, নারীকে নয়। যেমন বর্ণসংকর সম্বন্ধেও তিনি নারীকে দায়ী করেননি, যেমন করেছে ভগবদ্‌গীতা।

৩

এ যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে নারীকে প্রেমের বাতাবরণে ছাড়া অন্যভাবে দেখা হয়নি। সে-ও যে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পারিবারিক ভূমিকার বাইরে সে-ও যে একজন নাগরিক, তারও যে একটা চিন্তা কল্পনা ও স্বপ্নের জগৎ থাকতে পারে যেখানে তার নিজস্ব সুখদুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতাবোধ থাকতে পারে এ সম্বন্ধে এ সাহিত্যে কোনো চেতনাই নেই। এই দিক থেকে বসন্তসেনার চরিত্রে শূদ্রক অন্য একটি মাত্রা আনতে পেরেছেন; সে শুধু প্রেমিকা নয়; সে প্রভু, নাগরিক, গৃহকর্ত্রী ও সখী। অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে প্রেমিকা ছাড়া অন্য পরিচয়েও নারী দেখা দেয়, যেমন গ্রীক নাটকে। অবশ্য রোমান নাটকে বিশেষত নিউ অ্যাটিক কমেডিতে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রেমিকারই। একথাও সত্য যে অন্য যে-ভূমিকাতেই নারী অবতীর্ণ হোক না কেন সেটিও পুরুষ পরিকল্পিত পূর্বনিরূপিত একটি ছক, তার সীমার মধ্যেই নারীর সঞ্চরণ। তবু সেখানে তার প্রসার কিছু বেশি, তার সত্তার অন্য কিছু দিক স্বীকৃত ; শুধু দেহমাত্রসার নায়িকার যান্ত্রিক ভূমিকাতে ভোগ্যবস্তুরূপে সে দেখা দেয়নি। সংস্কৃত ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে কিন্তু প্রেমই তার একমাত্র বাতাবরণ ; তাই গুপ্তপ্রণয়, দূতী, সংকেতস্থল ও অন্তঃপুরের কুঞ্জকাননের মধ্যেই তার বিচরণ। নায়িকার শ্রেণীবিভাগও প্রেমের অবস্থা অনুসারেই : পূর্বরাগ, মান, মিলন ও বিরহ। প্রকারভেদও তাই : অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, মানিনী, খণ্ডিতা, স্বাধীনভর্তৃকা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বর্ত্মাবলোকিনী ইত্যাদি। দেহ অনুসারে তার ভাগ শঙ্খিনী, পদ্মিনী, হস্তিনী ইত্যাদি। গৃহে সে স্বামী সন্তান ও শ্বশুরকুলের সেবায় একনিষ্ঠ থাকবে এই-ই প্রত্যাশিত। বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রভাবে যেমন প্রেমিকারূপে তার প্রতিষ্ঠা, শাক্তসাহিত্যের প্রভাবে তেমনি তার মাতৃরূপ বিঘোষিত। সেখানে তার প্রতি সমাজের আচরণের ক্ষতিপূরণ হয়েছে দেবী ও শক্তিরূপে তার স্তবের দ্বারা। তখন আদর্শায়িত সেই নারী হয় অসুরদলনী বিশ্বজননী, নয় পরমা নায়িকা শ্রীরাধা। সাংখ্যে ও তন্ত্রে সে পরমা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি। এই কল্পরূপের অন্তরালে যে নারী ছিল বাস্তবে, সে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সব মৌলিক মানবিক অধিকারে বঞ্চিত, ভোগ্যবস্তু ও সেবিকা মাত্র।

খ্রীস্টীয় পঞ্চম থেকে একাদশ শতকের ভারতবর্ষ হল হিন্দু ভারতবর্ষ। একদিকে যেমন বৌদ্ধ জৈন প্রভাব সমাজ থেকে অন্তর্হিত, অন্যদিকে তেমনি মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়নি তখনো। এই ভারতে শূদ্র ও নারী একেবারে নিচের তলার বাসিন্দা; খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের বেদাঙ্গ সাহিত্য থেকেই এদের



Scanned with CamScanner

নাম একনিঃশ্বাসে উচ্চারিত। খ্রীস্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে মোটের ওপর ভগবদ্‌গীতা ও মনুসংহিতার স্বার্থপ্রণোদিত প্রভাবে তাদের স্থান তৎকালে ও উত্তরকালের জন্যে স্থিরীকৃত হয়ে গেল। পঞ্চম ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সমাজে কিছু স্থিতিস্থাপকতা ও সজীবতা ছিল, তখনো পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। নানা নতুন চিন্তার ও ধারণার ঘাতপ্রতিঘাত এসে পৌঁছত দেশের মনোজগতে। সপ্তম শতকের পরে ইয়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল, রইল শুধু দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে, সেখান থেকে ভারতবর্ষ নতুন কোনো চিন্তা বা ধারণা পায়নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরে আর্যাবর্তে অত বড় সাম্রাজ্য আর গড়ে ওঠেনি, আর্যাবর্ত ক্রমে খণ্ডিত হয়ে গেল ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্যে। সংকীর্ণ দ্বৈপায়ন মনোবৃত্তির প্রসার ঘটল ; বিজ্ঞানে কিছু উন্নতি ঘটলেও চিন্তার জগতে আর নতুন ঢেউ এসে লাগল না। গতানুগতিকের চর্চা, টীকাভাষ্য ও স্মৃতিরই বিস্তার ঘটল। অষ্টম থেকে দশম শতকে অর্ধমাগধী থেকে অবহট্টের বিকাশ ঘটল, দশম-একাদশ শতকে কথ্যভাষা ও লিপির প্রবর্তন হল ধীরে ধীরে। আঞ্চলিকতার স্বল্পসলিল পঙ্কিলতার মধ্যে স্রোতহীন জীবন আবর্তিত হতে থাকল। আর্যাবর্তে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক সভ্যতার মুক্ত বায়ু গতি হারাল ; বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ এক সভ্যতার উদ্ভব হল, যার প্রভাবে সমাজ ক্রমেই বেশি রক্ষণশীল হয়ে উঠল। এ রক্ষণশীলতায় সবচেয়ে বেশি করে দণ্ডিত হয়েছে নারী ও শূদ্র। পুরাণ, স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রের যুগ এটা, এসবগুলিই দৃঢ় করে তোলে এই রক্ষণশীলতাকে।

পরিশেষে ভেবে দেখা উচিত এই যুগে কারা লিখছে ও কাদের জন্যে লিখছে ; ব্যাপক গণশিক্ষা ছিল না তখন, ফলে লেখক ও পাঠক একই শ্রেণীর লোক : শিক্ষিত, মোটামুটি অবস্থাপন্ন ও দ্বিজ ! অল্প কিছু বিত্তবান্ শূদ্র শিক্ষার সুযোগ হয়ত পেত, তারা পড়তে পারত কিন্তু সেই সম্পত্তিমান্ শূদ্রের শ্রেণীচরিত্র ততদিনে বদলে ঐ পূর্বের শ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। ফলে সাধারণভাবে শূদ্র অবজ্ঞাত ; সাহিত্যে তার প্রতিবিম্ব হল সে মূর্খ, বুদ্ধিহীন, অতএব শ্লেষ বিদ্রূপ ও কৌতুকের লক্ষ্য। ব্যতিক্রম কদাচিৎ আছে, যেমন মৃচ্ছকটিকে ব্রাহ্মণ বিদূষক মৈত্রেয় মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে, শূদ্র স্থাবরক তার চেয়ে বুদ্ধিমান্। অন্যত্রও ব্রাহ্মণ বিদূষক মাঝেমাঝেই নির্বুদ্ধির ভূমিকায় দেখা দিয়েছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে বিদূষক একটি পূর্বনির্ধারিত ছাঁচ, সেখানে তার নির্বুদ্ধিতা ততটা ব্যক্তির নয়, যতটা প্রতীকী। 'রাজতরঙ্গিণী'-তে শূদ্র অশিক্ষিত, রুচিহীন ; ডোম্বী বর্বর ; কিন্তু কল্‌হণ বড় শিল্পী এবং সৎ ঐতিহাসিক ; তাই অপক্ষপাত চিত্রণে দেখি দ্বিজ ব্রাহ্মণও বহুস্থল ঐরূপে চিত্রিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও মন্ত্রী স্বার্থসর্বস্ব ; ক্ষত্রিয় রাজা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ; কায়স্থ কুটিল, অসৎ ; বরং সাধারণ শূদ্র সৈন্য সৎ ও প্রভুভক্ত। অসৎ রাজার রাজত্বে সাধারণ শূদ্রগরিষ্ঠ প্রজাবৃন্দের দুর্গতির বিবরণের মধ্যে এবং সে দুর্গতির দায়িত্ব রাজাকে অর্পণ করে কল্‌হণ শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন, কবি-ঐতিহাসিকের সততা রক্ষা করেছেন। নারী সম্পর্কে বহু নিন্দাবাদ করেও তিনি বারেবারেই নিঃস্বার্থ, প্রজাহিতৈষিণী, আত্মত্যাগে অকাতর বহু নারীকে চিত্রিত করেছেন। তেমনি ভবভূতি যে-সমাজে বাস করতেন তা নারী সম্পর্কে নিষ্ঠুর, কিন্তু কবি ভবভূতির ক্রান্তদর্শিতা তাঁকে এমন একটা লোকোত্তর



Scanned with CamScanner

বোধে উত্তীর্ণ করেছিল যেখানে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল যে, নারী সমাজে কখনো সুবিচার পায়নি : যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ। সামান্যতম স্খলনে এবং অস্খলনেও নারীনিন্দায় সমাজ পঞ্চমুখ। কবির পরিশীলিত সংবেদনা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে সীতা চরিত্রে, সমাজকে সমালোচনা করেছে রামচরিত্রে। কালিদাসের ঔশীনরী, সীতা ও শকুন্তলাতেও এ প্রতিবাদ মুখ্য বা গৌণভাবে ভাষা পেয়েছে। যেমন রঘুবংশের ও উত্তররামচরিতের অনুতপ্ত বেদনাদীর্ণ রামের রূপায়ণে সহস্রাব্দের সামাজিক মূল্যবোধ পুনর্মূল্যায়িত।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মুখপাত্র উত্তম কবিরা যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও বোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে রচনায় প্রবৃত্ত হন তার দাবি হল : শুধু নিজের ও শ্রোতার শ্রেণীচরিত্রের প্রবক্তা হলেই চলবে না, সেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সমালোচকও হতে হবে এবং আগামীর পথিকৃৎও হতে হবে, কারণ কবি ক্রান্তদর্শী। সাধারণত, কোনো নতুন উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পর্কগুলি যখন একটা যুগে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে তখন তার প্রথম দিকের কবিরা সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীচরিত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে অবচেতনের আভাসে অবহিত থাকেন, তার চিত্রণ ও সমালোচনা করেন, কখনো-বা পুনর্বিন্যাসের পথ দেখাবার চেষ্টা করেন। পরবর্তীরা সে সম্বন্ধে আর তত সচেতন থাকেন না ; তাঁরা পূর্বনির্ধারিত কাঠামোকে মেনে নিয়ে তার মধ্যেই নানা আঙ্গিকের কসরৎ ও মুন্সিয়ানা দেখাবার চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকেন। শূদ্রের শোষণ ও উৎপীড়ন দ্বিজ ও বিত্তবান্-শাসিত সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে সুবিধার ছিল এই যুগে। নারীকে সেবিকা ও ভোগ্যবস্তুর ভূমিকায় রেখে পদানত রাখাও পুরুষ ও তার পরিবারের পক্ষে বিশেষ সুবিধার ছিল ; তাই এ দুজনের সম্পর্কে কবি-নাট্যকাররা ধর্মশাস্ত্রকারদের সঙ্গে সর্বদাই একমত। কিছু সংবেদনশীল স্বপ্নদর্শী সাহিত্যশিল্পীই শুধু এর ব্যতিক্রম ; এঁরাই এক বিশেষ অর্থে বৈপ্লবিক সমাজচেতনায় আগামীর পথিকৃৎ।

---

Scanned with CamScanner